মুলপাতা

শাপলার দশ বছর পর:বাস্তবতা ও বিকল্প পথ

Asif Adnan

2023-05-10 16:09:35 +0600 +06

16 MIN READ
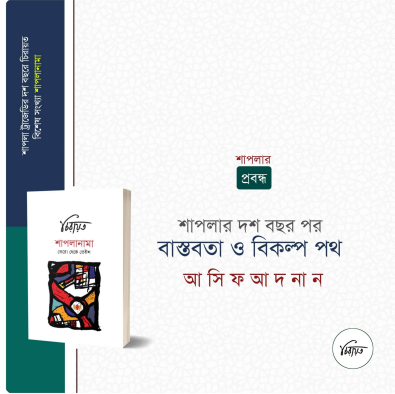
২০১৩-এর শাপলা চত্বর বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সমাজের ভেতরে থাকে অনেক গভীর ফাটল, অনেক দগদগে ঘা শাপলা ও শাহবাগের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে আমাদের সামনে এসেছে। ২০১৩ অনেক মানুষকে বদলে দিয়েছে। কিছু মানুষকে অন্ধকার থেকে ধাক্কা দিয়ে, টেনে এনেছে ঈমানের আলোতে। আর কিছু মানুষকে নিয়ে গেছে আলো থেকে অন্ধকারে। পরের দশ বছরে অনেক কিছু বদলালেও এই সত্য

বদলাবে না। শাপলা চত্বর ইতিহাসের অংশ।

২০১৩ তে বাংলার মুসলিমদের একত্রিত করা হেফাজতে ইসলাম নানা কারণে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আজ দুর্বল। উলামায়ে কেরাম, দা'ঈ এবং বক্তাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে নানা ধরণের হয়রানি, মামলা আর জঘন্য প্রোপাগ্যান্ডার। অন্যদিকে আধুনিকতা, সেক্যুলারিজম আর যুলুমের স্রোত সমাজকে প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছে। গভীর আত্মিক, নৈতিক ও ঈমানী সংকটের খাদে পড়ে গেছে সমাজ। পড়ে তো গেছেই ওঠার শক্তি কিংবা ইচ্ছা কোনটাই দেখা যাচ্ছে না।

এ অবস্থায় ইসলাহ ও তাজদীদের মাধ্যমে ঈমানের পুনঃজাগরণ আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে এমন এক সময়ে যখন নানা কারণে ইসলামী ঘরানাগুলো দুর্বল, কোণঠাসা এবং স্থবির। এ অবস্থায় করণীয় কী হতে পারে, তা নিয়ে কিছু ভাবনা ও প্রস্তাবনা তুলে ধরাই এ লেখার উদ্দেশ্য।

বাস্তবতাঃ

সমাধানের আলোচনায় যাবার আগে, বাস্তবতার ছবিটা আমাদের সামনে স্পষ্ট থাকা দরকার। রোগ নির্ণয় ছাড়া ওষুধ

দেয়া যায় না। তাই আগে বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার দুটো দিক সংক্ষেপে দেখে নেয়া যাক।

একদিকে আমরা দেখছি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলো খোলাখুলি যিনা এবং অন্যান্য যৌন বিকৃতির প্রচারণা করছে। ওয়েবসিরিজ থেকে শুরু করে নানা ভাবে মিডিয়াতে ছড়ানো হচ্ছে চরম ধরণের অশ্লীলতা। মাদকের ব্যবহার পৌছে গেছে মহামারীর পর্যায়ে। পশ্চিমাদের সমর্থন, সহযোগিতা ও অর্থায়নে চলছে ঘৃণ্য এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের কর্মকাণ্ড। পাঠ্যবইয়েও ট্র্যান্সজেন্ডারিসম (transgendarism) নামক বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ চলছে। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা লিপ্ত হচ্ছে যিনা থেকে শুরু করে নানা ধরণের যৌনবিকৃতিতে। দেশে এমনও বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ফ্রি কনডম বিতরণ হয়, সমকামিদের নিয়ে অনুষ্ঠান হয় প্রকাশ্যে। সুদ, ঘুষ, পরকীয়া, গর্ভপাত সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। নতুন প্রজন্ম বড় হচ্ছে বিজাতীয় পোশাক, চিন্তা, সংস্কৃতি এবং আকীদাহ নিয়ে। ভাঙ্গছে পরিবার, ভাঙ্গছে সমাজ। আর দেশের রাজনীতি আর অর্থনীতির অবস্থা তো সবার জানাই, আলাদা করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

অন্যদিকে—পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মস্থল এবং

সার্বিকভাবে জনপরিসরে বোরকা-নিকাব, দাড়ি-টুপির জন্য হয়রানি ও বৈষম্য। সমাজে ইসলামের অবস্থান থেকে কথা বলার সুযোগ ক্রমশ কমছে। নানাভাবে বাঁধা দেয়া হচ্ছে ওয়াজের ক্ষেত্রে, অপমান করা হচ্ছে বক্তাদের। ইসলামের সর্বস্বীকৃত বিধিবিধান পালন করার ইচ্ছাকে বলা হচ্ছে উগ্রবাদ। রীতিমতো পত্রিকার প্রথম পাতায় বিশাল বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বলা হচ্ছে, কেউ যদি হালাল-হারাম, ঈমান-কুফর আর তাওহিদ ও শিরকের সীমানা মেনে চলতে চায়, তাহলে সে চরমপন্থী।

পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতায় ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে একটি নীতি অনুসরণের কথা বলা হয়: "সন্দেহাতীতভাবে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 'নির্দোষ' হিসাবে গণ্য করা হবে"। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ধারণ করা মুসলিমদের জন্য ক্ষেত্রে এই নীতি উল্টে গেছে। আজ কাউকে জেলে দেয়া বা হয়রানি করার জন্য কেবল 'জঙ্গি' বলে দেয়াই যথেষ্ট। কী প্রমাণ, কী বিচার, কোন কিছু নিয়ে কারও মাথাব্যাথা নেই। মুসলিমমাত্রই দোষী গণ্য করাটাই আজ রীতি।

এই হল আমাদের বাস্তবতার সংক্ষিপ্ত ছবি। আমরা প্রায়ই বলি বাংলাদেশ ৯০% মুসলিমের দেশ। কিন্তু একে কি ৯০%

মুসলিমের দেশের বাস্তবতা বলা যায়? আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কিভাবে আমরা এ অবস্থায় এসে পৌছালাম? কোন এক সরকার, সরকারী পলিসি বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে দায়ী করে এ অবস্থাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বাস্তবতার শেকড়কে চিনতে হলে উপসর্গ পেরিয়ে আমাদের তাকাতে হবে মূল কারণগুলোর দিকে।

সেক্যুলারিসম, সেক্যুলার রাষ্ট্র, সেক্যুলার গোষ্ঠী:

সেক্যুলারিসমকে উপস্থাপন করা একটি নিরপেক্ষ (neutral) রাজনৈতিক দর্শন ও শাসন কাঠামো হিসেবে। আমাদের সমাজের গতানুগতিক বয়ান অনুযায়ী সেক্যুলারিসম হল ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদ। সেক্যুলার রাষ্ট্র এমন এক কাঠামো যেখানে এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকেদের ওপর তাদের অবস্থান চাপিয়ে দিতে পারে না। রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান।

কিন্তু এই তাত্ত্বিক সংজ্ঞার সাথে সেক্যুলারিসম ও সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবতা মেলে না। প্রকৃতপক্ষে সেক্যুলারিসম ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ না, বরং ধর্মের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রন। ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, আলোচনার বিষয়বস্তু, সীমানা, ধর্ম কী কী

রূপ নিতে পারবে, এমনকি ধর্মের কোন কোন বিধান পালন করা যাবে—এই সবগুলো আলোচনাকে সেক্যুলার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রন করতে চায়। সেক্যুলার রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছেমতো ধর্মকে পুনর্গঠন করে। সেই ঠিক দেয় কোনটা ধর্মের 'সঠিক' ব্যাখ্যা, আর কোন ব্যাখ্যা 'ভুল'।

এ বাস্তবতার বহু উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে আছে। ওয়াজের মঞ্চ কিংবা মিম্বারে কী বলা যাবে আর কী বলা যাবে না, তা নিয়ে হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে, ভাস্কর্য আর মূর্তির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী হওয়া উচিৎ, কিংবা ইসলামের কোন বিষয়গুলো মানা যাবে আর কোনগুলো মানা 'চরমপন্থার' ইঙ্গিত বহন করে; তা নিয়ে আলোচনা—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন একটা অংশ ধর্মের ব্যাখ্যাকার, মুফতি কিংবা মুফাসসির হিসাবে আবির্ভূত হয়।

সেক্যুলার সংবিধানের অধীনে যে ধর্মীয় 'স্বাধীনতা' দেয়া হয় সেটা হলো গোলামকে দেয়া মনিবের স্বাধীনতার মতো। গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা গরু যেমন দড়িতে টান পড়ার আগ পর্যন্ত 'স্বাধীনভাবে' চলাফেরা করতে পারে, চিড়িয়াখানার বাঘ যেমন খাঁচার ভেতরে 'স্বাধীনভাবে' যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, সেক্যুলারিসমও ধর্মকে তেমনই 'স্বাধীনতা' দেয়। কাজেই তত্ত্বে

যাই থাকুক, বাস্তবে সেক্যুলারিসম হল ধর্মকে রাষ্ট্রের অধীনস্ত করা। প্রত্যেক সেক্যুলার রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি ধর্ম সেক্যুলার সংবিধান, সংসদ ও সরকারের অধীনস্ত।

সেক্যুলার রাষ্ট্র ধর্মের জন্য একটা ছোট্ট বক্স তৈরি করে। তারপর জোর করে, কাটছাট করে ধর্মকে ঢোকায় ঐ বক্সের ভেতরে। সময়ের সাথে সাথে এই বক্সের আয়তন ছোট হতে থাকে। সংকুচিত হতে থাকে ধর্মের জন্য নির্ধারিত বলয়। ছোট হতে হতে এক সময় বৃত্ত পরিণত হয় বিন্দুতে। আর এই পুরো সময় জুড়ে বাড়তে থাকে সমাজে অবক্ষয়, বিকৃতি, মহান আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ।

আজ বাংলাদেশে আমরা ঠিক তাই দেখছি। যতো দিন যাবে, এ অবস্থার অবনতি হতে থাকবে। পশ্চিমা বিশ্বে পরিবার, সমাজ ও নৈতিকতার ভয়াবহ যে অবস্থা আমরা আজ দেখছি তার সবকিছু ধাপে ধাপে আমদানী এবং প্রচার করা হবে এ দেশেও। এ বিষয়টি কোন নির্দিষ্ট সরকার বা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত না। বরং এটি সেক্যুলারিসম ও সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার সহজাত এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আগুনের ধর্ম যেমন পোড়ানো, পানির ধর্ম যেমন ভেজানো, তেমনি ধর্ম ও নৈতিকতাকে সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে উচ্ছেদ করা

সেক্যুলারিসমের ধর্ম।

আর এই সেক্যুলার বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষ গেঁথে আছে নিয়মতান্ত্রিক ও কাঠামোগতভাবে। এর প্রভাব ছড়িয়ে আছে সমাজ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা, মিডিয়াতে উপস্থাপন, প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দিকে। কারণ বাংলাদেশের সমাজকে নিয়ন্ত্রন করা সেক্যুলার গোষ্ঠী; যারা নিজেদের সেক্যুলার-প্রগতিশীলসহ নানান নামে পরিচয় দিয়ে থাকে, ঐতিহাসিকভাবে ইসলামকে তাদের মূল আদর্শিক প্রতিপক্ষ মনে করে।

সক্রিয়ভাবে ইসলামবিদ্বেষ ধারণ করা লোকেরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু মিডিয়া, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, নাগরিক সমাজ এবং প্রশাসনের বিশাল অংশকে নিয়ন্ত্রন করে এরাই। এই অংশটি সমাজের বাকি অংশকে নিজস্ব আকীদাহ ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করতে চায়। তাদের অবস্থান কোন এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ঘরানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না, বরং বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পুরো বয়ানটাই তাদের তৈরি, এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাদের গড়ে তোলা বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ, বাঙ্গালি পরিচয় এবং তথাকথিত সম্প্রীতির বয়ান সরাসরি ও সমাজের সেক্যুলারায়ণ এবং ইসলামবিদ্বেষের প্রকল্পকে শক্তিশালী করে।

বাংলাদেশে তারা এমন এক সমাজ কাঠামো গড়ে করেছে যেখানে খুব সহজে মুসলিমদের ‘অপর’, ‘অদ্ভূত’ কিংবা ‘শত্রু’ প্রতিপন্ন করা যায়।

সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠী একটা সীমিত সীমানার ভেতরে কিছু আচার-আচরণ ও কথাকে ‘অনুমোদিত ইসলাম’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর বাইরে আর সব কিছু “অননুমোদিত ইসলাম”। কোন ইসলাম অনুমোদিত এবং কোন ইসলাম অননুমোদিত, ইসলামের কোন ব্যাখ্যা ‘সঠিক’ আর কোনটা ‘অপব্যাখ্যা’, তার সাথে অর্থাৎ শরীয়াহর দলিলের কোন সম্পর্ক নেই। আলিমউলামাদেরও এখানে কোন কিছু বলার সুযোগ নেই। এগুলো পুরোপুরিভাবে সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে। তারা যা বলবে, যেভাবে বলবে, মেনে নিতে হবে। তা না হলে জুটবে মৌলবাদী, উগ্রবাদী কিংবা জঙ্গি খেতাব।

বাংলাদেশের সমাজের এই অবক্ষয় এবং ইসলাম ও মুসলিমদের দুর্বলতার মূল কারণ সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য। তারা দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, সম্প্রীতি, অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তচিন্তা, অধিকার, বাকস্বাধীনতার মতো নানান বুলি এবং ধারণার মাধ্যমে নিজেদের গড়া যুলুমতান্ত্রিক

এই সমাজ ব্যবস্থার বৈধতা উৎপাদন করে।

কাজেই আমাদের সামনে থাকা বর্তমান প্রেক্ষাপটের জন্য জন্য দায়ী সেক্যুলারিসম এবং বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর আধিপত্য। যতোদিন সেক্যুলারিসম ও সেক্যুলার গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য বজায় থাকবে, ততোদিন এ অবস্থা বদলাবে না। দেশের ৯৯% মানুষ মুসলিম হলেও না।

ইসলাম ও সেক্যুলারিসমের দ্বন্দ্বই তাই বাংলাদেশের সমাজ ও শাসনের মূল দ্বন্দ্ব। কোন নির্দিষ্ট সরকার, রাজনৈতিক দল এখানে মুখ্য না। বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখতে হলে সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য ভাঙ্গা আবশ্যক। সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য ভাঙ্গা, সামাজিক শক্তি অর্জন এবং সমাজের মানুষের চিন্তায় পরিবর্তন না আনলে যতোই ক্ষমতার পালাবদল হোক না কেন, বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের অবস্থার উন্নতি হবে না। বরং সেক্যুলারাইযেইশান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দিন দিন সমাজে ইসলামের জায়গা আরও সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। বাড়বে ইসলামবিদ্বেষ, অশ্লীলতা, অবক্ষয় এবং অবমাননা।

অন্ধ গলি

সেক্যুলারিসমের এই সর্বগ্রাসী প্রকল্প আর সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মোকাবেলা করার পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর না। গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী ঘরানা নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে। পালন করেছে বিভিন্ন সেক্যুলার রাজনৈতিক জোটের জুনিয়র পার্টনার আর রাজপথ দখলের গুটির ভূমিকা।

নির্বাচনের সময় নেতানেত্রীদের হাতে তসবীহ উঠেছে, মাথায় বসেছে কাপড় কিংবা টুপি। বিভিন্ন সময় দেয়া হয়েছে ফাঁপা কিছু প্রতিশ্রুতিও। ইসলামী দলগুলো সেক্যুলার জোটে গেছে। বিশাল জনশক্তির কারণে ক্ষমতার লড়াইয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজপথের দখল নিতে ইসলামী ঘরানাগুলোর বরাবরই একটা গুরুত্ব ছিল এবং আছে। কিন্তু দিনশেষে সব ‘আন্দোলনের’ ফসল গেছে সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলোর ঘরেই। এভাবে ইসলামী ঘরানাগুলো বারবার রাজনীতির নোংরা খেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। আজও ইসলামী ঘরানাগুলোকে সেক্যুলারদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে যারা টেনে আনতে চাচ্ছে, তারাও রাজপথের খেলায় জিতে গেলে, ইসলামকে কোণঠাসা করে নিজেদের

সেক্যুলার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে। গতকালের মিত্ররা সক্রিয় শত্রু হয়ে যাবে। এমনটাই হবে, এমনটাই হয়ে এসেছে। এটাই রূঢ় বাস্তবতা।

পাশাপাশি, আরেকটি দিকও লক্ষনীয়। নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামী দলগুলোর অংশগ্রহণ, এই কাঠামোকে বৈধতা দিয়েছে। আর এই বৈধতাকে পুঁজি করে সেক্যুলার ব্যবস্থা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে একের পর এক পদক্ষেপ। সেক্যুলার রাজনীতি বা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ তাই কেবল হালাল-হারাম বা জায়েজ-নাজায়েজের প্রশ্ন না। বরং শাখাপ্রশাখাগত বিশ্লেষণ পাড় হয়ে মূল সমস্যা এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের বিশ্লেষণ এখানে আবশ্যক।

নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কার্যকরী না, বরং সামগ্রিক বিচারের ক্ষতিকর। গত চার দশকের বাস্তবতা প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। গণতন্ত্র, সংবিধান কিংবা দেশপ্রেমের কথা বলেও লাভ নেই, কারণ এ শব্দগুলোর অর্থ, সীমানা ও ব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রন করে ঐ সেক্যুলার-প্রগতিশীল জমিদার গোষ্ঠীই। একইসাথে বাংলাদেশের ইসলামী ঘরানাগুলোর সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতাও বিবেচনা করতে হবে। রাষ্ট্রের সাথে সংঘাতে যাওয়া তাদের জন্য কাম্য না, এবং সম্ভবও না।

তাহলে সমাধান কোন পথে?

বিকল্প?

সেক্যুলারিসমের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন এবং সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিকল্প সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। আদর্শিক এ যুদ্ধের অক্ষ চারটি:

১। সমাজের মানুষের ইসলাহ,

২। যেসব ধারণা, মতবাদ ও মতাদর্শকে ব্যবহার করে সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠী নিজেদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রন টিকিয়ে রাখে, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান এবং চ্যালেঞ্জ করা

৩। সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের বয়ানের বিপরীতে, সেক্যুলারিসমের বিকল্প হিসেবে সামগ্রিকভাবে ইসলামের বয়ানকে উপস্থাপন করা

৪। জনসংযোগ ও গণমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে সামাজিকভাবে ইসলামী দাওয়াহ এবং ইসলামের আদর্শকে শক্তিশালী করা

এই চারটি অক্ষের ব্যাপারে কিছু কথা যুক্ত করা হল।

ইসলাহ: সমাজের বর্তমান মর্মান্তিক বাস্তবতা এবং গুনাহর ব্যাপক স্বাভাবিকীকরণের বিষয়টি থেকে মানুষের ইসলাহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের আবশ্যকতা স্পষ্ট। চলমান ইসলাহী কর্মকান্ডগুলো নিজ নিজ পরিসরে ভূমিকা পালন করলেও তা যথেষ্ট না। নববী মেজাজে, তাজদীদি লক্ষ্য নিয়ে সমাজে প্রচলিত মুনকারগুলো নিয়ে সরাসরি এবং ব্যাপকভাবে মানুষকে সতর্ককরতে হবে। এটিই নবীর ওয়ারিশদের দায়িত্ব ও উত্তরাধিকার। মসজিদ কমিটির দৌরাত্ম্য কিংবা ওয়াজ-মাহফিলে বাঁধার কারণে যদি কথাগুলো বলা না যায়, তাহলে নিজস্ব উদ্যোগে আলাদাভাবে দাওয়াতী সফর এবং উদ্যোগ নিতে হবে। আর এ পদ্ধতি অপরিচিত কিছু না, এর উদাহরণ এ ভূখন্ডের নেককার পূর্বসূরীদের মাঝে রয়েছে।

সেক্যুলার ধারণা, মতবাদ ও বয়ানকে প্রত্যাখ্যান: সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর ব্যবহৃত ধারণা, মতবাদ ও মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান ও চ্যালেঞ্জ করা আবশ্যক, কারণ এটিই তাদের সামাজিক আধিপত্যের বুনিয়াদী ভিত্তি। এগুলোর মাধ্যমেই প্রজন্মের পর প্রজন্মকে তারা শুধু দ্বীন ইসলামের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে না, বরং বুনে চলেছে ইসলামবিদ্বেষ ও অবক্ষয়ের বীজও। সেক্যুলারদের মতবাদ কিংবা ঐতিহাসিক বয়ানের ‘ইসলামীকরণ’-এর চেষ্টা অবধারিতভাবে ব্যর্থ হবে।

শুধু তাই না, এই ব্যর্থ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে অনেক মুসলিমের নিজের ইমান ও আকীদাহও। এখানে একমাত্র কার্যকরী পন্থা হল, এইসব ধারণা ও মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করা, এবং সেগুলোর বৈধতা প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করা। ফিরাউনের জাদুকরদের জাদুর নিস্ফলতা সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেয়া আবশ্যক।

বিদ্যমানতার বিকল্প হিসেবে ইসলামের সামগ্রিক উপস্থাপনা: একইসাথে প্রয়োজন সেক্যুলার ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামের সামগ্রিক উপস্থাপনা। যতোক্ষণ মানুষ ইসলামকে শুধু ‘আসমানের ওপরের আর যমিনের নিচের’ আলোচনা হিসেবে দেখবে ততোক্ষণ ইসলামী ব্যবস্থা অধিকাংশের কাছে তাত্ত্বিকতা হিসেবেই থেকে যাবে। বাস্তব সমাধান হিসেবে ইসলামের কথা তারা চিন্তা করবে বা চিন্তা করতে পারবে না। তাই ঈমানী, আমলী, এবং আকাইদী বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোকে ইসলাম কিভাবে ব্যাখ্যা ও মোকাবেলা করতে শেখায় তা মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। আকীদাহ, মাসায়েল, তাযকিয়াতুননাফসের মত বিষয়গুলো যেমন ইসলামের অংশ। তেমনি সমাজ, শাসন, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি কিভাবে চলবে, এই আলোচনাগুলোও ইসলামের অংশ। আর্থ-সামাজিক

বিষয়গুলোর আলোচনা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না।

দুঃখজনকভাবে গতো আট-নয় দশক ধরে অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর আলোচনার দিকে খুব একটা মনোযোগী হয়নি বা হতে পারেনি। আজ দ্বীনি শিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালনের দাওয়াহ এবং সাদাকাহ-যাকাত সংক্রান্ত কিছু উদ্যোগের মধ্যেই আমাদের অধিকাংশ কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, একথা বললে ভুল বলা হবে না। কারণ যাই হোক, সমাজের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নেতিবাচক। এর ফলে মানুষের চিন্তার জগতে নিজে থেকেই এক ধরণের বিভাজন তৈরি হয়ে গেছে। মানুষ ধরেই নিয়েছে অর্থনীতি, সামাজিক সমস্যা, শাসন, যুলুমের মোকাবেলার মত বিষয়গুলোর সমাধানের পথ হল সেক্যুলার রাজনীতি। এগুলোর জন্য যেতে হবে সেক্যুলার রাজনীতির পথে। আর ইসলামী ব্যক্তিত্ব বা সংগঠনগুলোর কাছে মিলবে কেবল “ধর্মীয়” বিষয়ের সমাধান।

এই ধরণের চিন্তার অবধারিত ফলাফল হল সমাজ ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রন সেক্যুলার-প্রগতিশীল শ্রেণীর হাতে চলে যাওয়া। গত আট-নয় দশকে উপমহাদেশে ঠিক তাই ঘটেছে। আর বিভিন্ন সেক্যুলার দল ও গোষ্ঠী তাদের আকীদাহ এবং

এজেন্ডা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রকে চালিয়ে নিয়ে গেছে। ইসলামী দাওয়াহকে সত্যিকারভাবে সামাজিক শক্তিতে পরিণত করতে হলে ব্যক্তিগত অঙ্গন থেকে একে বের করে আনতে হবে। আর তা করার অন্যতম উপায় হল আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও সমস্যা নিয়ে ইসলামের অবস্থান থেকে আলোচনা নিয়ে আসা।

জনসংযোগ ও গণমুখী কর্মসূচী: সবশেষে এই পুরো দাওয়াহকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এবং মানুষকে এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজন জনসংযোগ ও গণমুখী নানা কর্মসূচী ও উদ্যোগ, যেখানে মাদ্রাসার ছাত্রশিক্ষকদের পাশাপাশি সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার ছাত্ররাও সংযুক্ত হয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে। যেখানে আলিমগণের দিকনির্দেশনায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দ্বীনদার মুসলিমরা তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা গঠনমূলকভাবে কাজে লাগাতে পারবে দ্বীন ইসলামের কল্যাণে। এধরণের দাওয়াতি কর্মসূচী শহর ও গ্রামের সাধারণ মুসলিমদের সামনে ইসলাম জীবন্ত একটি আদর্শ ও ব্যবস্থা হিসেবে ইন শা আল্লাহ আবারও উপস্থিত করবে। এই সব কিছু হবে ইমানী-আমলী, আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অক্ষকে কেন্দ্র করে, রাজনৈতিক কোন অক্ষ এর মাঝে থাকবে না। মাযহাব-মাসলাকভিত্তিক মতপার্থক্য এবং ঐতিহাসিক তর্কগুলো

যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। বর্তমান অবস্থায় এসব অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব আমাদের দুর্বলতাকে বাড়াবেই কেবল, কমাবে না।

এই চার অক্ষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আদর্শিক এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সামাজিক শক্তি অর্জন। সামাজিক শক্তি শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রে আসা নির্দিষ্ট অর্থকে বোঝানো হচ্ছে। পারিভাষিক অর্থে সামাজিক শক্তি হল:

> *"...এমন সব ধরণের প্রভাব ও চাপপ্রয়োগের সক্ষমতার সমষ্টি যা (সমাজের) কোন এক গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রয়োগ করে। এই শক্তি প্রয়োগ করা হয় অন্যদের আচরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে, অথবা সামষ্টিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সেই গোষ্ঠীর নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে"। [**Gene Sharp, How Non-Violent Struggle Works**]*
>
> *[**Gene Sharp, How Non-Violent Struggle Works**]*

***

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধের এ পদ্ধতি সহজ না। গত কয়েক দশক ধরে গতানুগতিক যেসব কর্মসূচীতে ইসলামী ঘরানাগুলো অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সে তুলনায় এধরণের কাজ তুলনামূলকভাবে বেশি চ্যালেঞ্জিং। তবে একই সাথে এটিও সত্য যে, এ পদ্ধতি সুন্নাহ এবং নেককার পূর্বসুরীগণের পথের অধিকতর নিকটবর্তী। আমাদের সোনালী অতীতে এ পদ্ধতির দৃষ্টান্তও আছে প্রচুর। তাই তাওয়াক্কুল, ইখলাস ও ইস্তিকামাতের সাথে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হলে, উত্তম ফলাফল আসা সম্ভব। উলামায়ে কেরাম যদি এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যদি ইখলাসের সাথে এ কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে আল্লাহ চাইলে সফলতা আসবে নিশ্চয়। বর্তমানের দুর্বলতা অতিক্রম ইসলাম এ মাটিতে সামাজিকভাবে আবারও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

আমরা সব সময় ইসলাম পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা। শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা। আজ সময় এসেছে এই বিশ্বাসকে মুখে, কিংবা কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে, মানুষের সামনে আবারো জীবন্ত সত্য হিসেবে উপস্থাপন করার। এটি নিছক তাত্ত্বিকতা বা কল্পকথা না। এই ব্যবস্থা প্রবল প্রতাপের সাথে একসময় বিশ্বকে শাসন করেছে, জন্ম দিয়েছে হাজার বছরের চোখধাঁধানো সভ্যতার। এবং আজো এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নযোগ্য। আসমান ও

যমীনসমূহের মালিক আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

> إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ
>
> كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

> নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তারাই সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, ‘আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব।’ নিশ্চয় আল্লাহ মহা শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী।
>
> *সূরা আল-মুজাদালা*

এটি কেবল একটি প্রস্তাবনা, তবে আল্লাহ চাইলে এটি নতুন চিন্তা এবং উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। সাফল্য কেবল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত।

শা'বান, ১৪৪৪

মুলপাতা

শাপলার দশ বছর পর:বাস্তবতা ও বিকল্প পথ

16 MIN READ

BY

Asif Adnan

2023-05-10 16:09:35 +0600 +06